রেশমি 'চুড়ি'র ইতিহাস

ময়ূরাক্ষী সেন

নারীদের যেকোনো সাজ চুড়ি ছাড়া যেন অসম্পূর্ণ। চুড়ি মূলত বাংলাদেশ ভারত, নেপাল, পাকিস্তান ও দক্ষিণ এশিয়ার ঐতিহ্যবাহী অলংকার। বাজারে হরেক নামের চুড়ি পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙালি নারীদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে রেশমি চুড়ি। যেকোনো দেশি সাজের সাথে বাঙালি নারীদের পছন্দের জায়গা দখল করে রেখেছে রেশমি চুড়ি। বিশেষ করে যেসব নারীরা নিজের নান্দনিকতা ফুটিয়ে তুলতে চায় তাদের কাছে রেশমি চুড়ি প্রিয় হয়ে উঠেছে। রেশমি চুড়ি দৃষ্টিনন্দন তো বটেই, তার থেকেও বেশি মন কেড়ে নেয় এ চুড়ির রিনিঝিনি শব্দ। প্রায় সব কবিরাই তাদের প্রেমের কবিতায় প্রেমিকার চুড়ির রিনিঝিনি শব্দের মধুর বর্ণনা করেছেন। বাঙালি নারীদের সাথে চুড়ির গভীর প্রেম যুগ যুগ ধরে। আর রেশমি চুড়ি লোকজ ঐতিহ্যের অংশ।

বাংলায় নারীদের চুড়ি ব্যবহারের ইতিহাস অনেক পুরোনো। তবে রেশমি চুড়ির ইতিহাস প্রায় একশ বছর আগের। তখন জমিদার ও নবাব পরিবারে নারীদের হাতে রেশমি চুড়ি থাকাটা ছিল অবধারিত। তারা তাদের ঘরে নারীদের উপস্থিতি টের পেতেন কাচের চুড়ি শব্দে। তাই তাদের জন্য বিশেষ নকশায় রেশমি চুড়ি বানানো হতো। ভারতীয় উপমহাদেশে চুড়ি ঠিক কবে চালু হয়েছে তা সঠিকভাবে জানা নেই। তবে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক খননকালে খোল, তামা, ব্রোঞ্জ, সোনা ও আকিক পাথরের চুড়ি পাওয়া যায়। পাকিস্তানের মহেঞ্জোদারোতে (যিশুখ্রিস্টের জন্মেরও ২৬শ বছর আগে) পাওয়া এক মূর্তিতে দেখা যায় নৃত্যরত বালিকার বাম হাতে চুড়ি রয়েছে। ধারণা করা হয় তখন দুহাতে চুড়ি পরার প্রচলন ছিল না। অন্যদিকে মৌর্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন ডিজাইনের চুড়ি পাওয়া গেছে ভারতের তক্ষশীলায়। ভাস্কর্য, বিভিন্ন প্রাচীন লেখা নথি, কাব্য, নাটক, চিত্র ইত্যাদিতে বিচিত্র ধরনের চুড়ি পরার ধরন, কারণ ও প্রেক্ষাপটের কথা আমরা জানতে পারি। শাসক বা উচ্চশ্রেণির পুরুষ ও নারী দামী ধাতুর চুড়ি পরতেন। আবার বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ও আঞ্চলিকতায় চুড়ি ব্যবহারের অর্থ ও তাৎপর্য বদলে যায়। অনেক জায়গাতেই বিবাহিত নারীরা একটি লোহার চুড়ি পরিধান করে থাকে। অলংকার আবিষ্কার হবার সাথে সাথেই চুড়ির আবির্ভাব। হাত ভর্তি চুড়ি এক সময় আভিজাত্য প্রকাশ করতো। কিন্তু রেশমি চুড়ি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে বাংলার মাটিতেই। বাংলার নারীরা এই ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রেখেছে।

একটা সময়ে কাচের চুড়ি শুধু গোল হতো, এতে বিশেষ কোনো নকশা থাকতো না। কিন্তু এখন এই কাচের চুড়ির উপর নানারকম নকশা করা হয়ে থাকে। এছাড়া খাঁজকাটা, চুমকি ও পাথর বসানো নানা নকশার কাচের চুড়ি পাওয়া যায়। রঙের কোনো বাধা নেই এইসব কাচের চুড়িতে। সব ধরনের রঙের বাহার দেখা যায় কাচের চুড়িতে। অনেক কাচের চুড়ির উপর জরি কিংবা ছোট ছোট ফুলের নকশা করা হয়ে থাকে। অনেকে এইসব চুড়ি মোটা একটা বালার সাথে পরে, যা অনেক নজরকাড়া হয়ে থাকে।

যেকোনো পোশাকের সাথেই রেশমি চুড়ি পরা গেলেও নারীরা দেশি পোশাকের সাথে পরতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। পহেলা বৈশাখ, পহেলা ফাল্গুনে চুরি কেনার জন্য প্রতিযোগিতা লেগে যায়। পোশাকের সাথে মিলিয়ে সব বয়সি নারীরা চুড়ি কেনে। কেউ কেউ চুড়ি এক হাত ভরে পরে আবার কেউ কেউ দুই হাতেই পরে। অনেকে নিজের ব্যক্তিত্বে বাঙালিয়ানা ফুটিয়ে তুলতে কুর্তি ফতুয়া স্কার্ট-এর সাথে রেশমি চুড়ি

পরে থাকে, যা বেশ দৃষ্টিনন্দন হয়। রেশমি চুড়ি যেকোনো পোশাকের সাথেই দারুণ মানিয়ে যায়। সাদামাটা কোনো পোশাকের সাথে হাত ভর্তি রেশমি চুড়ি পরলে অনেক রঙিন দেখায়। গ্রামাঞ্চলে এখনো নতুন বউয়ের হাত ভর্তি রেশমি চুড়ি পরার প্রচলন আছে। তারা নতুন বউয়ের হাত খালি থাকাকে অমঙ্গলের প্রতীক হিসেবে ধরে। নতুন বউয়ের রিনিঝিনি কাচের চুড়ির শব্দ সবার মাঝে আমেজের সৃষ্টি করে। তাই বিয়ের ডালা ভরে হরেক রকমের রেশমি চুড়ি আসে নতুন বউয়ের বাড়িতে।

রেশমি চুড়ি শুধু অলংকার ছিল না, ছিল আবেগ। গ্রামে বিকেল হলেই ঝুড়িতে করে হরেক রকমের রেশমি চুড়ি নিয়ে আসতো বিক্রেতারা। বাড়ির মেয়ে বউরা অপেক্ষায় থাকতো সেই চুড়িওয়ালীর। তারা 'চুড়ি চুড়ি' বলে হাঁক দিতে দিতে আসতো। বাড়ির মেয়েরা সে শব্দে বেরিয়ে আসত। অনেকে অনেকদিন ধরে টাকা জমাতো শুধু কাচের চুড়ি কিনবে বলে। সবাই সেই চুড়িওয়ালীকে ঘিরে বসে গল্প করতে করতে চুড়ি দেখতো আর কিনতো। এখনো এই সোনালি ঐতিহ্য হারিয়ে গিয়েছে প্রায়। আর শহরে তো একদম নেই। ধীরে ধীরে রেশমি চুড়ির চাহিদাও কমে যাচ্ছে। এখন নানারকম ভারতীয় পাকিস্তানি চুড়ির মেলা বসেছে বাজারে, অনেকেই সেইসবের দিকেই ঝুঁকছে। যেসব কারখানা রেশমি চুড়ি বানায় তাদের মাধ্যমে জানা গেছে ভুরি ভুরি রেশমি চুড়ি কারখানায় পড়ে আছে। কারণ বেচাকেনা নেই। তারা অপেক্ষা করে পহেলা বৈশাখ ও পহেলা ফাল্গুনের জন্য। কারণ এইসময়টা তাদের ভালো যায়। তখন ধুম পড়ে যায় চুড়ি কেনার। এই উৎসব আমেজ ছাড়া কেউ তেমন চুড়ি কেনে না। ঢাকায় বেইলি রোডে চুড়ির পসরা সাজিয়ে বসেন একজন চুড়িওয়ালী। নাম তার জোবেদা খাতুন। বাড়ি রংপুর। এই চুড়ি বিক্রি করে তার জীবিকা নির্বাহ হয়। প্রতিদিন চুড়ি বিক্রির পর যা টাকা আসে তা দিয়েই দিন চালাতে হয়। কষ্টের সুরে তিনি বলেন, সেই ভোর হতেই চুড়ি নিয়ে এসে বসি, এমনও দিন গেছে একটা চুড়িও বিক্রি হয়নি। খালি হাতে ঘরে ফিরতে হয়েছে।

তাই রেশমি চুড়ির কদর শুধু দেশি উৎসবে না রেখে সারাবছর রাখতে হবে। যাতে করে খেটে খাওয়া মানুষরা ভালো থাকতে পারে। কারণ শত শত মানুষের জীবিকা নির্ভর করে আছে এই চুড়ির উপর। তাছাড়া আমাদের ঐতিহ্যর সাথে জড়িয়ে আছে রেশমি চুড়ি। ঐতিহ্য ধরে রাখার দায়িত্ব আমাদেরই। তা না হলে আমাদের সংস্কৃতি থেকে তা বিলীন হয়ে যাবে। রেশমি চুড়ির জন্ম আজকে না অনেক বছর আগে। এতো দিন এই চুড়িকে বাঁচিয়ে রেখেছে এই বাঙালিরাই। তাই যাতে এটি পুরোপুরিভাবে হারিয়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

রেশমি চুড়ি পাওয়া সম্ভব খুব সহজে। অন্যান্য চুড়ির তুলনায় এর দামও হাতের নাগালে। বেইলি রোড, টিএসসির মোড়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি ভবনের পাশে, চারুকলায়, দোয়েল চত্বরে, আজিজ সুপার মার্কেটে, ইডেন কলেজ, নিউ মার্কেটে কাচের চুড়ি বিক্রি করতে দেখা যায়। দাম ৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকার মধ্যেই। এছাড়া যমুনা ফিউচার পার্ক, বসুন্ধরা সিটি, পিংক সিটি, পুলিশ প্লাজার মতো জায়গায় কিছু দোকানে কাচের চুড়ি দেখা যায়। কিন্তু এসব জায়গায় কাচের চুড়ি ক্রেতাদের তেমন আনাগোনা নেই বললেই চলে। কাচের চুড়ি সাধারণত সবাই রাস্তার ধারের চুড়িওয়ালীদের কাছে থেকে কিনতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।